দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JAN 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আবদুল্লাহ আল-মুতী

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সমাজ জীবনে ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই দুইয়ের ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এপথেই শুধু এদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটা সম্ভব। আর এই উদ্দেশে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থাকতে হবে।

সুখের বিষয় ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত প্রথম শিক্ষা কমিশন এ সত্যটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাও পেশ করেছিলেন। এই কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন ঃ

১৫·২ বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে একশ্রেণীর মানুষকে শক্তিশালী করে তোলা তা নয়, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ত্বরান্বিত করা। এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমেই এরূপ যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে।......জগতের বিভিন্ন দেশ বিজ্ঞান শিক্ষার যে অগ্রগতি সম্পাদনে সমর্থ হয়েছে আমরা তার তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়ে আছি। এ অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষাকে অধিকতর ব্যাপক এবং অন্যান্য দেশের মানের সমকক্ষ করতে হবে।[১]

এই সুপারিশকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য ১৯৭৫-৭৭ সালে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয় তার ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ

......বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে ধার করা কেতাবী শিক্ষায় পরিণত না করে তাঁকে আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করে নির্মাণ করার প্রচেষ্টার উপর নতুন পাঠ্যসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রাথমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য বিষয় হিসেবে 'পরিবেশ পরিচিতি' নামে একটি নতুন বিষয়ের মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মৌল ধারণাগুলো শিক্ষার্থীর মনে তার শৈশবকাল থেকেই স্থাপন করার জন্য পাঠ্য-সূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানকে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্তরে উল্লিখিত সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোকে ব্যাপকত্ব ও গুরুত্বদানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।[২]

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার পেছনে দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অভিশাপ অনেকাংশে কাজ করেছে। প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর দু'যুগের পাকিস্তানী আমলে জাতীয় স্বার্থকে সামনে এনে সত্যিকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এই পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে ডঃ মফিজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত ১৯৮৭-৮৮ সালের দ্বিতীয় বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ঃ

৮·১০ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আবির্ভাব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে ঘটেছে; তার ফলে এদেশে এখনো বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার যথোপযুক্ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিস্তৃত নাহলে এই ঐতিহ্য গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।

৮·১১ বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়; তার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাতে-কলমে কাজ ও অনুসন্ধান গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অভিভাবকগণ সম্যক অবহিত না হওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষকগণও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের অভাবে তাঁদের শিক্ষাদানকার্যে যথেষ্ট অবদান ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথির মাধ্যমে লাভ সম্ভব নয়, এজন্য শিক্ষকের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনেকাংশে অর্থহীন—এ সকল বিষয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আজো যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন।[৩]

দীর্ঘকালের অবহেলার ফলে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সর্বব্যাপী গভীর দৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব কাটাতে হলে দীর্ঘদিনব্যাপী সুবিন্যস্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শেষোক্ত কমিশন তাঁদের রিপোর্টে অন্যত্র বলেছেন, বিজ্ঞানের সাথে রয়েছে জীবনের সরাসরি যোগাযোগ। বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়।......[১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে কলা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানকে নৈর্বাচনিক করার ফলে] অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখন বিজ্ঞান পাঠ করছে না। এই অবস্থা আমরা সন্তোষজনক বলে মনে করি না। সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নবম ও দশম শ্রেণীতে আবশ্যিকভাবে যাতে বিজ্ঞান পড়ান যায় সে বন্দোবস্ত করা অত্যাবশ্যক।[৪]

সকলের জন্য বিজ্ঞান

বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদান যথা— পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, শ্রবণ-দর্শন উপকরণ, সহায়ক বইপত্র প্রভৃতির অপ্রতুলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি সচেতন। মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর সহায়তায়) এসব অভাব দূর করার ব্যাপক উদ্যোগ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ (বিশেষত পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বিষয়ে) থেকে নানা উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে 'সকলের জন্য বিজ্ঞান' চালু করার জন্য এসকল উদ্যোগ আরো বিস্তৃত ও গভীর হবার প্রয়োজন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের দিকে আজ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ

১· বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। যথা— অনুসন্ধান; পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; শুধু নানা বিষয়ে তথ্য আহরণ নয়; প্রকৃতির নানা কার্যক্রমের পদ্ধতি উপলব্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন। এসবের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

২· সকলের জন্য বিজ্ঞান প্রবর্তন করতে হলে সে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতি অবশ্যই জীবনভিত্তিক এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট হতে হবে। এজন্য বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিমার্জনা ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

৩· বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ের বিষয়টি সামনে আনতে হবে। এজন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি ও উপযোগের সংযোগ যেমন ঘটানো চাই, তেমনি প্রযুক্তির কল্যাণকর ও অকল্যাণকর দিক সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে হবে।

১৯৮৩ সালে ব্যাংককে ইউনেস্কো আয়োজিত এক বিশেষজ্ঞ সভায় 'সকলের জন্য বিজ্ঞান'-এর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ঃ

ক। শিক্ষার্থী বিষয়টিকে তার দৈনন্দিন জীবনে জরুরী প্রয়োজন অথবা অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে মূল্যবান মনে করবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার জগতে এর অর্থপূর্ণ প্রয়োগযোগ্যতা থাকবে।

খ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনমান উন্নত হবে অথবা তার উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং এতে সমাজের ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা ঘটবে।

গ। এর ভিত্তি হবে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা; তার বাস্তব জীবনের নানা উপাদানের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবে এবং তার কাজে, অবসরে বা বাড়িতে এর সুস্পষ্ট ব্যবহারযোগ্যতা থাকবে।

ঘ। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে এমন প্রাকৃতিক ঘটনা—যা শিক্ষার্থীর মনে বিস্ময় ও উদ্দীপনা সঞ্চার করে।

ঙ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কিছু প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে এবং সে দক্ষ বৃত্তমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করতে শিখবে।

চ। বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং অহেতুক সেসবের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করবে না।

ছ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী জাতীয় উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে।

জ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার পরিবেশের নানা সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে শিখবে এবং প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনপদ্ধতি আয়ত্ত করবে।[৫]

এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে প্রণীত আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পুনর্বিবেচনা ও পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সৌজন্যে ঃ শিক্ষা ও বিজ্ঞান, মাঘ-চৈত্র ১৩৯৫ সংখ্যা।

শিক্ষা ও বিজ্ঞান